

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস
(আই.)-এর ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ মোতাবেক ২৩ ইখা, ১৪০৫ হিজরী শামসীর
জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন,
মহানবী (সা.)-এর সাদাসিধে জীবনের আলোচনা আমি শুরু করেছিলাম। তাঁর (সা.)
অনাড়ম্বরতার অন্যতম দিক ছিল, কখনো কখনো তিনি নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই
বাজার থেকে কিনতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ
(সা.)-এর সাথে বাজারে প্রবেশ করি। তিনি (সা.) কাপড়ের ব্যবসায়ীর কাছে বসেন।
অতঃপর তিনি (সা.) চার দিরহামের বিনিময়ে পায়জামা বা সালোয়ার অর্থাৎ ঢোলা পায়জামা
ক্রয় করেন। সে যুগে এটির প্রচলন ছিল। আমাদের কেউ কেউ 'সালোয়ার' অনুবাদ করেছে,
কিন্তু তা সালোয়ার নয় বরং ঢোলা পায়জামা ছিল। যাহোক, বাজারের লোকদের একজন
মেপে দিত, যে জিনিসপত্র ওজন করত। অর্থাৎ, তখন কাপড় পাল্লায় ওজন করে বিক্রি করা
হতো। রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেন, ওজন করো এবং (ওজন) কিছুটা বেশি ধরো। অর্থাৎ,
যতটুকু কেনা হয়েছে তার চেয়ে ওজন কিছুটা বেশিই ধরো। ওজনকারী বলে, এটি এমন
একটি কথা যা আমি কারো কাছ থেকে শুনি নি। মানুষজন তো সাধারণত বলে, ওজন যেন
কম হয় যেন মূল্য কম আসে; কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, মূল্য বেশি হয় হোক, ওজন বেশি
এবং সঠিক হওয়া চাই; আর সতর্কতার দাবি হলো, পাল্লা যেন সেদিকেই ঝুঁকে থাকে যদিও
জিনিসটি রাখা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি তাকে বলি, তুমি যে নিজের নবীকে চেনো
না- এটাই তোমার নিজ ধর্মের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও অসৌজন্যতার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট!
যখন সে বিস্ময় প্রকাশ করে, তখন তাদের পরস্পরের মাঝে অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা
(রা.)-র সাথে তার কথা শুরু হয়ে যায়। সে দাঁড়িপাল্লা ছুড়ে ফেলে দেয় এবং রসূলুল্লাহ
(সা.)-এর হাতে চুম্বন করার উদ্দেশ্যে ত্বরিত এগিয়ে আসে। রসূলুল্লাহ (সা.) নিজের হাত
গুটিয়ে নেন এবং বলেন, এটি কী? অন্যরব লোকেরা নিজেদের বাদশাহদের সাথে এমনটি
করে থাকে, কিন্তু আমি তো বাদশাহ নই। সে ছিল অপরিচিত এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে
তার নিয়ত জাগতিক বলে মনে হয়েছে। এজন্য তিনি (সা.) বলেন, না, আমি বাদশাহ নই;
এজন্য তোমাকে এভাবে চুম্বনের উদ্দেশ্যে হাত দিতে পারি না। কেননা আমি তো তোমাদেরই
মতো একজন মানুষ। অতঃপর সে ওজন করে এবং ওজন কিছুটা বেশি ধরে। রসূলুল্লাহ
(সা.) তার কাছ থেকে সেই কাপড় ক্রয় করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি
সেগুলো নেবার জন্য মহানবী (সা.) পূর্বেই এগিয়ে যাই, তখন তিনি (সা.) বলেন, জিনিসের
মালিক নিজেই তা বহন করার বেশি অধিকার রাখে; তবে সে যদি দুর্বল হয় এবং তা বহন
করতে অক্ষম হয়, তাহলে তার মুসলমান ভাই তাকে সাহায্য করবে। হযরত আবু হুরায়রা
(রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি কি এমন পায়জামাও
পারেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সফরে ও গৃহে অবস্থানকালে, রাতে এবং দিনে আমি পরিধান
করি; কেননা আমাকে লজ্জা নিবারণের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি লজ্জা নিবারণের
জন্য এর মতো উত্তম কোনো পোশাক দেখি না। এটি অত্যন্ত চমৎকার পোশাক।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলতেন, হযরত আবু বকর (রা.) আমার ঘরে প্রবেশ করেন। সে সময় আমার কাছে আনসার মেয়েদের মধ্য থেকে দুটি মেয়ে ছিল। তারা সেই কবিতাগুলো পড়ছিল যা আনসার ‘বুয়াস’ যুদ্ধের সময় গিয়েছিল। ইসলামের পূর্বে মদীনার অধিবাসীরা অর্থাৎ অওস ও খায়রাজ গোত্র গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং আরবের ইতিহাসে তাদের মধ্যকার সর্বশেষ যে যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো ‘বুয়াসের যুদ্ধ’; এটি এই নামেই পরিচিত। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের যুগে যখন তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন এটি সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর মদীনায় হিজরতের আগেই এই যুদ্ধ হয়েছিল এবং শেষও হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, সেই গায়িকা মেয়েরা আমার কাছে বসে ছিল। তারা কোনো পেশাদার গায়িকা ছিল না, বরং আমারই বান্ধবী ছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা কি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে শয়তানের বাঁশি নিয়ে বসেছ? আর এই ঘটনাটি ছিল ঈদের দিনের। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতিরই একটি ঈদ (আনন্দের দিন) থাকে, আর আজ আমাদের ঈদ। অর্থাৎ, তাদের গান গাইতে দাও, বাধা দিও না। ঘরোয়া, সাদাসিধে ও অকৃত্রিম পরিবেশ ছিল, কোনো শিরকের কথা হচ্ছিল না, তাই অকারণে বাধা দেওয়া বা শাসন করাও উচিত নয়। তিনি (সা.) তাদের গাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

হযরত হিন্দ বিন আবি হালা (রা.)-র রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর প্রথমে সালাম দেবার বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, যার সাথেই তাঁর (সা.) সাক্ষাৎ হতো তিনিই (সা.) তাকে প্রথমে সালাম দিতেন; এমনকি শিশুদেরও তিনি প্রথমে সালাম দিতেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা.) একবার শিশুদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের সালাম দিয়েছেন। একইভাবে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন আনসারের কাছে যেতেন তখন তাদের শিশুদের সালাম দিতেন, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। অত্যন্ত সাদামাটা পরিবেশ ছিল, কিন্তু শ্রদ্ধার গণ্ডির ভেতর থেকে সাহাবীদের পক্ষ থেকেও একই রূপ প্রকাশ পেত এবং শিশুরাও পরম সম্মান বজায় রাখত। যে ব্যক্তিই মহানবী (সা.)-এর কাছে বসত বা কোনো প্রয়োজনে তাঁর সাথে কথা বলত, তিনি (সা.) তার সাথে ধৈর্য ধরে বসে থাকতেন, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজে উঠে চলে যেত। এই সারল্য ও ধৈর্য সাহায্যের মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলার বিষয়ে স্বস্তি ও সাহস জোগাত। আর এটিই সেই রীতি যা আমাদের পদাধিকারীদেরও অবলম্বন করা উচিত।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার পিতার কাছে মহানবী (সা.)-এর মজলিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) উঠতে-বসতে আল্লাহর যিকির করতেন এবং যখন কোনো সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন তখন মজলিস যেখানে শেষ হতো সেখানেই বসে পড়তেন এবং অন্যদেরও এমনটি করার নির্দেশ দিতেন। তিনি (সা.) পাশে উপবিষ্ট প্রত্যেক সঙ্গীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতেন। তাঁর (সা.) মজলিসে বসা কেউ এই ধারণা করত না যে, অন্য কেউ তার চেয়ে বেশি সম্মানিত। কেউ তাঁর (সা.) কাছে বসলে বা নিজের কোনো প্রয়োজনের কথা জানালে তিনি তাকে সময় দিতেন, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজেই উঠে চলে যেত। আর কেউ তাঁর কাছে কোনো অভাবের কথা জানালে তিনি তাকে খালি হাতে বা কোমল কথা না বলে ফিরিয়ে দিতেন না; অর্থাৎ হয় তাকে তা দিতেন, আর যদি দিতে না পারতেন তবে অত্যন্ত নম্রভাবে অপারগতার কথা বলতেন। তাঁর (সা.) হাসিমুখ, বদান্যতা ও উত্তম চরিত্র ছিল সার্বজনীন।

তিনি তাদের জন্য পিতার সমতুল্য হয়ে উঠেছিলেন। অধিকারের দিক থেকে তাঁর কাছে সবাই সমান ছিল। তাঁর (সা.) মজলিস জ্ঞান, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও গোপনীয়তা রক্ষাকারী মজলিস হতো। সেখানে কণ্ঠস্বর উঁচু করা হতো না, সম্মানিত বিষয়ের অমর্যাদা করা হতো না আর কারো দুর্বলতা বা ত্রুটিও প্রকাশ করা হতো না। সবাই পরস্পর সমান ছিলেন এবং কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতেই তারা একে অপরের ওপর প্রাধান্য রাখতেন। তারা পরস্পরের প্রতি বিনম্র আচরণ করতেন, বড়োদের সম্মান করতেন, ছোটোদের স্নেহ করতেন, অভাবগ্রস্তকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং বহিরাগতদের প্রতি যত্নবান থাকতেন।

তাঁর (সা.) সাদাসিধে বা অনাড়ম্বর বৈঠকের উল্লেখ একটি রেওয়ায়েতে এভাবে পাওয়া যায়, মহানবী (সা.)-এর মজলিস বা বৈঠকের কথা উল্লেখ করে হযরত জাবের বিন সামুরা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে একশবারেরও বেশি বসেছি। তাঁর সাহাবীরা (কবিতার) পঙ্ক্তি আবৃত্তি করতেন এবং অজ্ঞতার যুগের কিছু ঘটনা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন; কিন্তু তিনি (সা.) নীরব থাকতেন এবং কখনো কখনো তাদের সাথে মুচকি হাসতেন। অত্যন্ত সাদাসিধে বৈঠক বসত।

একইভাবে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু যার (রা.) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের মাঝে বসে থাকতেন। যখন কোনো আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তি আসত, তখন সে জিজ্ঞেস করা ছাড়া চিনতে পারত না যে, তাদের মধ্যে মহানবী (সা.) কে? মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের ঘটনা আমরা বহুবার শুনেছি। সেখানেও তাঁর সাদামাটা জীবনেরই দৃষ্টান্ত রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

এই হিজরতের সময় এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা মহানবী (সা.)-এর পরম অনাড়ম্বর জীবনের প্রমাণ বহন করে। মদীনার অধিকাংশ মানুষই তাঁর অবয়ব বা চেহারার সাথে পরিচিত ছিল না। যখন তিনি (সা.) কুবার বাইরে একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন এবং লোকজন মদীনা থেকে ছুটে তাঁর দিকে আসছিল, তখন মহানবী (সা.) যেহেতু অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বসে ছিলেন, তাই তাদের মধ্য হতে অপরিচিত লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখে, যিনি বয়সে ছোটো হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দাড়িতে কিছু সাদা চুল থাকায় আর একইভাবে তাঁর পোশাকও মহানবী (সা.)-এর চেয়ে কিছুটা ভালো হওয়ায় ধরে নিয়েছিল—আবু বকরই বুঝি আল্লাহর রসূল (সা.), এবং তারা পরম শিষ্টাচারের সাথে তাঁর (তথা আবু বকরের) দিকে মুখ করে বসে পড়ে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এ বিষয়টি দেখে বুঝতে পারেন যে, লোকেরা ভুল করছে—তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের চাদর মেলে ধরে সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনার ওপর রোদ পড়ছে, আমি আপনার ওপর ছায়া করে দিচ্ছি।’ আর এই সূক্ষ্ম ও সুন্দর কৌশলের মাধ্যমে তিনি লোকদেরকে তাদের ভুলটি ধরিয়ে দেন।

তাঁর (সা.) সাদাসিধে বৈঠকের কথা হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন:

একবার আমরা মসজিদে মহানবী (সা.)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এরইমধ্যে এক ব্যক্তি উটে চড়ে ভেতরে আসে এবং সে মসজিদে উট বসায়। অর্থাৎ মসজিদের বাইরের আঙিনায় বা খোলা ময়দানে উটটি বসায়, এরপর সে উটের হাঁটু বাঁধে। তারপর সে সেখানে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা.) কে? তখন মহানবী (সা.) তাদের মাঝে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমরা বলি, এই ফর্সা ও সুদর্শন ব্যক্তি, যিনি হেলান

দিয়ে বসে আছেন। তখন সেই ব্যক্তি তাঁকে (সা.) বলে, হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র! মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমিই তোমার সাথে কথা বলছি। এরপর সেই লোকটি মহানবী (সা.)-কে বলে, আমি আপনাকে প্রশ্ন করব এবং প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আপনার সাথে কঠোরতা অবলম্বন করব, কিন্তু আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। তিনি (সা.) বলেন, তোমার মনে যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করো। সে বলে, আমি আপনাকে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্ তা'লা কি আপনাকে সমগ্র মানবমণ্ডলির জন্য (রসূল হিসেবে) পাঠিয়েছেন? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ কসম, হ্যাঁ। সে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহ্ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন দিন-রাতে পাঁচবেলা নামায পড়ি? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ কসম, হ্যাঁ। সে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহ্ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, বছরের এই মাসে অর্থাৎ রমযানে আমরা যেন রোযা রাখি? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ কসম, হ্যাঁ। সে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহ্ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে আমাদের ধনীদেব কাছ থেকে সদকা (তথা যাকাত) আদায় করে তা আমাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ কসম, হ্যাঁ। তখন সেই ব্যক্তি বলে, আপনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন আমি তা মেনে নিলাম। আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে এসেছি; আর আমি হলাম যিমাম বিন সা'লাবা এবং আমি বনু সা'দ বিন বকর গোত্রের সদস্য। এটি বুখারী শরীফের হাদীস।

সাহাবীদেরকেও তিনি (সা.) সাদাসিধে জীবন যাপনের উপদেশ দিতেন। হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে সাতটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে বারণ করেছেন। যেসব কাজ করতে আমাদের বারণ করেছেন তা হলো— সোনার আংটি, 'হারীর' ও 'দীবাজ' অর্থাৎ নরম রেশম এবং 'ইস্তাবরাক' অর্থাৎ মোটা রেশম পরিধান করা, আর 'কাসসী' অর্থাৎ মিশর থেকে আনা এক বিশেষ ধরনের ডোরাকাটা কাপড় যাতে রেশম মেশানো থাকত, এবং রেশমের তৈরি ঘোড়ার জিনের আবরণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন জানাযার সাথে যাই, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করি এবং ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবাইকে সালাম তথা শান্তির দোয়া দিই।

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) পুরুষদের জন্য রেশম হারাম হবার পেছনে যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন তার একটি কারণ হলো গর্ব ও অহংকার; দ্বিতীয়ত, এটি বিলাসবহুল এবং সাজসজ্জার কাপড় যা পুরুষালি গান্ধীর্যের পরিপন্থি এবং নারীদের সাজসজ্জারই উপযুক্ত; তৃতীয়ত, পৌত্তলিকদের সাথে সাদৃশ্য। রেশমি জিনপোশ (বা ঘোড়ার জিনের আবরণ) নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, এর নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, অনারব অর্থাৎ রাজকীয় চালচলন সম্পন্ন রাজাদের সাথে সাদৃশ্য এবং অপচয় বা অহেতুক জাঁকজমক। একইভাবে সোনার অলংকার নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে ভাষ্যকার লিখেছেন, পারস্য ও রোমের নারী-পুরুষেরা সোনার অলংকারে সজ্জিত হতো এবং রোম ও পারস্য সম্রাট এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিরা সোনার রক্ষণ পরত যা তাদের বাহ্যকে ঢেকে রাখত। তারা সোনার হার, মুকুট এবং চেইনও ব্যবহার করত যা তাদের কাছে সৌন্দর্য, গর্ব, দম্ভ, অহমিকা এবং পৃথিবীতে অহংকার প্রদর্শনের মাধ্যম ছিল। তারা সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহারও করত। মিশরের ফেরাউনরাও প্রায়শ এসব কাজ করত।

একইভাবে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে সাহাবীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি একবার অসুস্থ হলে মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) পায়ে হেঁটে আমাকে দেখতে আসেন এবং তাঁরা আমাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। মহানবী (সা.) ওয়ু করেন, তারপর নিজের ওয়ুর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দেন; তখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে। তাঁর (সা.) জীবনে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, পরম সারল্য ছিল। সাহাবীদের প্রতিও তাঁর এই নির্দেশই ছিল, তারা যেন সাদাসিধে জীবন অবলম্বন করেন এবং তিনি তাদের এ বিষয়ে বোঝাতেন যেন তাদেরও সংশোধন হতে থাকে। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) নিজের বাহন নিজেই হাঁকিয়ে নিয়ে যেতেন এবং ফজরের নামাযের পর ও আসরের পর কিছুক্ষণ পায়চারিও করতেন।

অনাড়ম্বরতা সম্পর্কিত আরেকটি রেওয়ায়েতে নিজের সাদাসিধে জীবন যাপন এবং সাহাবীদের তা শেখানোর বিষয়টি উঠে এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন প্রতি তিনজন ব্যক্তি একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করতেন। হযরত আবু লুবাবা (রা.) এবং হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে একই উটে শরীক ছিলেন। যখন মহানবী (সা.)-এর পায়ে হাঁটার পালা আসে, তখন তাঁরা দুইজন নিবেদন করেন, আমরা আপনার পরিবর্তে পায়ে হেঁটে যাচ্ছি (আপনি উটেই বসে থাকুন)। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা দুইজন আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও, আর সওয়াবের ক্ষেত্রেও আমি তোমাদের চেয়ে অমুখাপেক্ষী নই। অর্থাৎ আমারও সওয়াবের প্রয়োজন রয়েছে, কাজেই যে নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে সে অনুযায়ীই আমল হবে। হযরত আমর বিন হারেস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কোনো দিনার অথবা দিরহাম কিংবা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী রেখে যান নি, শুধুমাত্র নিজের সাদা খচ্চরটি ছাড়া যেটার ওপর তিনি (সা.) আরোহণ করতেন; আর নিজের অস্ত্র এবং একখণ্ড জমিও (রেখে যান) যেটি তিনি মুসাফিরদের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর জীবনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) থেকে এটিও প্রমাণিত যে, তিনি উত্তম থেকে উত্তম খাবারও গ্রহণ করতেন, আবার এটিও প্রমাণিত যে, তিনি অনাহারেও থাকতেন; এবং কখনো কখনো এত দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকতেন যে, তাঁকে পেটে পাথর বাঁধতে হতো। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাঁর জীবন কৃতজ্ঞতা ও সারল্যের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে।

তাঁর (সা.) সাদাসিধে জীবন সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। তিনি কোনো কাজকেই লজ্জার বা ছোটো মনে করতেন না। নিজের উটকে নিজেই খাবার দিতেন, ঘরের কাজকর্ম করতেন, নিজের জুতা নিজেই মেরামত করে নিতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন, খাদেমকে নিজের সাথে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন, আটা পিষতে পিষতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে সাহায্য করতেন। বাজার থেকে ঘরের জিনিসপত্র বহন করে আনতে লজ্জাবোধ করতেন না। ধনী-গরিব সবার সাথে হাত মেলাতেন এবং আগে সালাম দিতেন। কেউ সামান্য খেজুরের দাওয়াত দিলেও তিনি তা তুচ্ছ মনে করতেন না, বরং গ্রহণ করতেন। তিনি (সা.) ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, কোমল স্বভাবের ও ধৈর্যশীল। তাঁর জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সবার সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করতেন, তাঁর চেহারা সবসময় মৃদু হাসি লেগে থাকত। তিনি কখনো অউহাসি হাসতেন না। আল্লাহর ভয়ে চিন্তিত থাকতেন,

কিন্তু তাঁর মধ্যে রুক্ষতা বা কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো প্রকার দুর্বলতা বা হীনম্মন্যতার ছাপও ছিল না। তিনি অত্যন্ত দানশীল অর্থাৎ উদার মনের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু অপচয় থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। তিনি কোমল হৃদয়ের, পরম দয়ালু ও স্নেহশীল ছিলেন এবং প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদয় আচরণ করতেন। এতটা পেট ভরে খেতেন না যার ফলে ঢেকুর উঠতে থাকে। কখনো লোভ বা লালসার বশবর্তী হয়ে কিছুর দিকে হাত বাড়াতেন না, বরং ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ এবং অল্পে তুষ্ট থাকতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপহার গ্রহণ করতেন এবং নিজেও উপহার পাঠাতেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপহার হলেও তা গ্রহণ করতেন এবং এর বিনিময়ে নিজেও উপহার দিতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবারকে ততটুকুই রিয়ক দাও যতটুকু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। নিজের সন্তানাদি ও পরিবারের জন্যও তিনি সাদাসিধে জীবনেরই আকাজক্ষা করেছেন এবং এরই দোয়া করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) কখনো কোনো খাবারের দোষত্রুটি ধরতেন না। খাবার পছন্দ হলে তিনি তা খেয়ে নিতেন, অন্যথায় রেখে দিতেন। অনেক সময় মানুষের কোনো খাবার পছন্দ হয় না; তেমন হলে তিনি কিছু বলতেন না, বরং সামান্য একটু চেখে নীরবে তা রেখে দিতেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) পশমের পোশাক এবং মেরামত করা জুতা পরেছেন। অর্থাৎ ‘পশম’ হলো খসখসে উলের তৈরি গরম কাপড় যা শীতকালে পরা হতো; তিনি (সা.) তা-ও পরেছেন এবং মেরামত করা জুতাও পরেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বদা মোটা ও সাধারণ খাবার খেতেন এবং সাদাসিধে পোশাক পরতেন। যখন জিজ্ঞেস করা হলো, ‘মোটা ও সাধারণ খাবার’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তখন তিনি বলেন, যবের মোটা রুটি— যা এক ঢোক পানি ছাড়া গলা দিয়ে নীচে নামত না। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যবের বিনিময়ে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। নিজের বর্মটি যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে যবের রুটি এবং পুরনো চর্বি নিয়ে যাই, যা থেকে কিছুটা গন্ধ আসছিল। আর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের কাছে সকাল ও সন্ধ্যার খাবারের জন্য এক সা’ ব্যতীত কিছুই নেই। এই এক সা’ পরিমাণ শস্য প্রায় আড়াই সের অর্থাৎ আড়াই কেজির সমান হতো, অথচ নয়টি ঘরের সদস্যদের এই খাবার খেতে হতো।

হযরত ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি, মহানবী (সা.) রুটির একটি টুকরোর ওপরে খেজুর রেখে বলেন, এটি এর তরকারি; অর্থাৎ তিনি খেজুর দিয়ে রুটি খাচ্ছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে গরম খাবার উপস্থাপন করা হয়। তিনি তা আহার করেন এবং (খাবার) শেষ করে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য! অনেক দিন ধরে কোনো গরম খাবার খাই নি। অনেক দিন পর আজ গরম খাবার খেলাম।

হযরত আয়েশা (রা.)-র বরাতে উরওয়া বর্ণনা করেন, তিনি উরওয়াকে বলেন, হে আমার ভাগ্নে! আমাদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, কখনো কখনো দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যেত এবং আমরা তৃতীয় মাসের চাঁদও দেখতে পেতাম, অথচ মহানবী (সা.)-এর কোনো

ঘরেই চুলা জ্বলত না। আমি জিজ্ঞেস করি, তাহলে আপনারা কীভাবে দিন কাটাতেন? তিনি বলেন, এই দুটি কালো জিনিস— অর্থাৎ খেজুর এবং পানি দিয়ে। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর কিছু আনসার প্রতিবেশী ছিলেন যাদের দুধেল উটনী ছিল। তারা নিজেদের বাড়ি থেকে মহানবী (সা.)-কে দুধ পাঠিয়ে দিতেন এবং তিনি (সা.) আমাদের সবাইকে সেই দুধ পান করাতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এমন সময়ে মৃত্যুবরণ করেন যখন আমরা ‘আসওয়াদাইন’ অর্থাৎ খেজুর ও পানি তৃপ্তি সহকারে খেতাম। সেগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকত এবং (আমরা) তা দিয়েই ক্ষুধা নিবারণ করতাম; খেজুর খেতাম আর পানি পান করতাম। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ‘আল-আসওয়াদান’ তথা দুটি কালো জিনিস বলতে খেজুর এবং পানি বুঝানো হয়েছে। যদিও কালো রঙ কেবল খেজুরেরই, পানির নয়; পানি তো কালো হয় না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমরা দুটি কালো জিনিস দিয়ে জীবন ধারণ করতাম। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, দুটির মধ্যে একটির আধিক্যের কারণে উভয়কে একই বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে। যখন দুটি জিনিসের একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তখন দুটির মধ্যে অধিক পরিচিত বা প্রধান বস্তুটির নামানুসারে সেগুলোকে অভিহিত করা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা’লার সাথে যাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে এমন লোকদের খোরাক সবসময় কম হয়ে থাকে; অর্থাৎ একই রকম উপায়-উপকরণ, স্বাস্থ্য ও পাকস্থলীর অধিকারী মানুষের তুলনায় তারা কম খাবার খান। এমন নয় যে, যদি কোনো মানুষের পেট খারাপ থাকে এবং সে বেশি খেতে না পারে— তাহলে বলা হবে, তার আধ্যাত্মিকতা বেশি। কারণ শর্ত হলো, অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাও একই রকম হতে হবে। একই অবস্থায় যে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা থাকবে, সে অন্যের তুলনায় কম খাবে। এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, মু’মিন এক পেট বা অল্প দিয়ে খায় এবং কাফির খায় সাত পেট বা অল্প দিয়ে। স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর জীবনযাত্রা অধ্যয়ন করলে জানা যায়, তাঁর খোরাক খুবই অল্প ছিল।

একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, “পবিত্র ও নির্মল মানুষদের পেট পুরে খাওয়া সে ধরনের পেট ভরা নয়, যা সেসব মানুষের হয়ে থাকে— যাদের সম্পর্কে খোদা তা’লা বলেছেন, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো খায় এবং আগুনই তাদের ঠিকানা। মহানবী (সা.)-এর কোনো এক সময় পেট পুরে আহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। আর যদি এই পেট ভরে আহার করাকে এমন লোকদের সাথে তুলনা করা হয় যাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যই হলো কেবল উপভোগ করা, অর্থাৎ স্বাদ আস্বাদন করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া, এবং যারা এর মাধ্যমে নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে চায়, যাদের দৃষ্টি কেবল প্রবৃত্তিগত কামনাবাসনা থেকে আনন্দ লাভের ওপর নিবদ্ধ— তাহলে এমন পেট পুরে আহার করাকে আমরা আদৌ একই অর্থে পেট ভরে আহার করা বলতে পারি না। পেট ভরে খাওয়ার সংজ্ঞা সম্পর্কে পবিত্র ও পুণ্যবানদের পরিভাষা আর অপবিত্র ও উদরপূজারীদের পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন। আর পবিত্র ব্যক্তির ততটুকু খোরাককেই পেট ভরে খাওয়া বলে গণ্য করেন, যতটুকু আহারের ফলে মোটামুটিভাবে ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায়, অর্থাৎ ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় এবং চলাফেরা ও অন্যান্য কাজকর্ম করার শক্তি অর্জিত হয়। [যখন মানুষের মধ্যে সামান্য শক্তি আসে এবং সে নিজের কাজ করতে সক্ষম হয়।] মোটকথা, মু’মিনের পেট পুরে আহার করা বলতে বোঝায়, সে এতটুকু খাদ্য গ্রহণ করবে যা তার শিরদাঁড়া সোজা রাখবে এবং

তাকে তার ওপর অর্পিত অবশ্যপালনীয় দায়িত্বাবলি পালনে সক্ষম করবে। কাজেই, যিনি সাইয়্যিদুল মুরসালিন [অর্থাৎ রসূলদের নেতা]— তাঁর পেট পুরে খাওয়ার বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের পেট ভরে খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়কে এক করে দেখার শামিল। [অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা সম্ভব নয়। তাঁর বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন; দুটোর মাঝে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান।] তিনি (আ.) বলেন, এভাবেই বহু মানুষ মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে নি। আর তারা শব্দের যথাযথ প্রয়োগ ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করে নি এবং নিজেদেরকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করেছে। মহানবী (সা.)-এর কোনো এক ক্ষেত্রে এ কথা বলা যে, ‘আমি পেট পুরে খেয়েছি’— এটি কখনোই সে কথার সমার্থক নয় যা জগতপূজারীদের মুখ থেকে বের হয়, যাদের কাছে জীবনের মূল উদ্দেশ্যই হলো খাওয়া-দাওয়া। মোটকথা, পবিত্র ব্যক্তিদের কাজ ও কথাকে পবিত্র ব্যক্তিদের উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বুঝতে হবে এবং তাঁদের বিষয়াদিকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করা যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই ইহজগতের উর্ধ্ব অবস্থান করেন, যদিও বাহ্যিকভাবে তাঁরা এই জগতেরই বাসিন্দা।

হযরত আবু উমামা বাহিলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের যবের রুটি কখনো অবশিষ্ট থাকত না। [অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ীই রুটি তৈরি করা হতো; ঠিক ততটুকুই বানানো হতো, যতটুকু খাওয়া হবে।] মহানবী (সা.)-এর যুগে গম ও ময়দার রুটি কেবল ধনী ব্যক্তিদেরই ভাগ্যে জুটত এবং তা-ও কখনো কখনো পাওয়া যেত। কারণ ওই অঞ্চলে গমের চাষ হতো না, বরং সিরিয়ার মতো দূরবর্তী অঞ্চল থেকে তা আমদানি করতে হতো এবং তা বেশ ব্যয়বহুল ছিল। এ কারণে মহানবী (সা.) সাধারণত যবের সাধারণ রুটিই পেতেন। তিনি (সা.) সেই রুটি খেয়েই (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। যবের সেই সাধারণ রুটিও ছেকে তৈরি করা হতো না বা মিহি হতো না, আর তা-ও প্রতিদিন পাওয়া যেত না। এটি কেবল মহানবী (সা.)-এরই নৈমিত্তিক জীবন ছিল না, বরং তাঁর পরিবারের সদস্যদের অবস্থাও এমনই ছিল। অর্থাৎ এক নাগাড়ে অনেক দিন যবের রুটিও তাঁদের ভাগ্যে জুটত না। যেমনটি আমি ইতিপূর্বে হযরত আয়েশা (রা.)-র রেওয়ায়েতের বরাতে বলেছি, তাঁরা খেজুর ও পানি দিয়েই জীবন ধারণ করতেন।

নওফেল বিন ইয়াস হুযালী বলেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) আমাদের সঙ্গে বসতেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তম একজন সঙ্গী। একদিন তিনি আমাদেরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমরা যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করি তখন তিনি ভেতরে যান এবং গোসল করে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে বসেন। এরপর আমাদের সামনে একটি বড়ো পাত্র আনা হয় যার মাঝে রুটি ও মাংস ছিল। খাবারটি যখন সামনে রাখা হয় তখন হযরত আব্দুর রহমান (রা.) কেঁদে ফেলেন। আমি বলি, হে আবু মুহাম্মদ! কী কারণে আপনি কাঁদছেন? তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ তিনি এবং তাঁর আহলে বাইত কখনও যবের রুটিও পেট ভরে খেতে পান নি!

পেট ভরে খাবার না খাওয়ার বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মৃত্যু পর্যন্ত কখনো এক দিনে দুবার রুটি ও জলপাইয়ের তেল পেট ভরে খান নি; এ অবস্থাতেই তাঁর ওফাত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একটানা অনেক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটাতেন এবং তাঁর পরিবারের লোকেরাও রাতে খাবার পেতেন না। অধিকাংশ সময় তাঁদের রুটি বলতে শুধু যবের রুটিরই ব্যবস্থা ছিল।

আবু হাযেম বলেন, আমি হযরত সাহল বিন সাদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহানবী (সা.) কি কখনো ময়দা খেয়েছেন? হযরত সাহল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে যখন থেকে আল্লাহ তা'লা নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তখন থেকে তাঁর (সা.) ওফাত পর্যন্ত তিনি কখনো ময়দা খান নি। আবু হাযেম বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মহানবী (সা.)-এর যুগে তোমাদের কাছে কি চালুনি ছিল? হযরত সাহল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে যখন থেকে আল্লাহ তা'লা নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তখন থেকে আমৃত্যু তিনি কখনো চালুনি দেখেন নি। আবু হাযেম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তোমরা না চলে যব কীভাবে খেতে? হযরত সাহল বলেন, আমরা সেগুলো পিষে ফেলতাম এবং তাতে ফুঁ দিতাম। ফলে যা উড়ে যাবার তা উড়ে যেত। যবের খোসা উড়ে চলে যেত। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা মেখে খামির তৈরি করতাম এবং সেই আটা [দিয়ে রুটি বানিয়ে] খেতাম।

মাসরুফ (রহ.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে গেলাম। তিনি (রা.) আমার জন্য খাবার আনতে বলেন এবং বলেন, যখনই আমি এক দিনে দুবার পেট ভরে খাই, তখনই আমার কান্না পেয়ে যায় এবং আমি কেঁদে ফেলি। আমি জিজ্ঞেস করি, কেন? তিনি (রা.) বলেন, তখন আমার মহানবী (সা.)-এর সেই অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়, যে অবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আল্লাহর কসম! মহানবী (সা.) কখনো এক দিনে দুবার রুটি ও মাংস পেট ভরে খান নি। হযরত আয়েশা (রা.) এ কথা বলেন নি যে, মহানবী (সা.) খান নি বলে আমিও খাই না। বরং আল্লাহ তা'লা যেসব নিয়ামত দান করেছেন, সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং যা পাওয়া যায় তা খাওয়া উচিত। অন্যথায়, খাবার থাকা সত্ত্বেও না খাওয়া- এটিও আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা হতে পারে। তবে হ্যাঁ, এমন সময় তাঁর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কথা মনে পড়ে যেত, তিনি (সা.) কখনোই দিনে দুই বেলা পেট ভরে খাবার খান নি। মূল বিষয় হলো, মানুষের উচিত তার কাছে যে নিয়ামতগুলো রয়েছে, সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া; কিন্তু একই সঙ্গে নিজের অতীতের সেই অবস্থার কথাও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ শাহ সাহেব (রহ.) বুখারীর ভাষ্যে লিখেছেন, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা (রা.) কী খেতেন- এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোতে সাহাবীদের জীবনের এমন ঘটনাসমূহের উল্লেখ রয়েছে, যখন ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাদের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়েও তাদের স্বল্পেতুষ্টি ও আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা এমন উচ্চ পর্যায়ে ছিল যে, আল্লাহ তা'লা যা দান করতেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট থাকতেন। পরবর্তীকালে যখন তাদের সম্পদ অর্জিত হলো, তখনও সম্পদের প্রাচুর্য তাদের স্বল্পেতুষ্টি, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ও নির্লোভ মনোভাবের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। উভয় সময়ই তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায়, আল্লাহ তা'লার নিয়ামতের মূল্যায়ন এবং তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, যখন কিসরা (তথা পারস্য সম্রাট) পরাজিত হলো এবং মুসলমানদের হাতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এলো, তখন সেই সম্পদের মধ্যে কয়েকটি বায়ুচালিত কলও ছিল, যেগুলোর সাহায্যে খুব মিহি আটা পেয়া যেত। এর আগে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীরা পাথরের জাঁতা বা পাথরের ওপর শস্যদানা পিষে নিতেন এবং ফুঁ দিয়ে সেগুলোর খোসা উড়িয়ে দিয়ে রুটি তৈরি করতেন। যখন মদীনায় বায়ুচালিত কল অর্থাৎ উইন্ডমিলের মতো যন্ত্র এল এবং এর সাহায্যে মিহি ময়দা তৈরি করা হলো, তখন হযরত

উমর (রা.) নির্দেশ দিলেন, প্রথমে সেই আটা যেন হযরত আয়েশা (রা.)-র সমীপে উপস্থাপন করা হয়, যেন সবার আগে তিনিই (রা.) সেই আটার তৈরি নরম নরম রুটি খেতে পারেন। অতঃপর তাঁর (রা.) নির্দেশ অনুসারে সেই আটা হযরত আয়েশা (রা.)-র সমীপে উপস্থাপন করা হলো। তিনি (রা.) একজন নারীকে তা দিলেন যেন সে সেগুলোর খামির বানিয়ে রুটি প্রস্তুত করে। যখন ময়দার গরম গরম, নরম নরম ফোলা রুটি প্রস্তুত করে তাঁর (রা.) সামনে আনা হলো, তখন তিনি (রা.) আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া আদায় করতে করতে একটি রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে দিলেন। কিন্তু সেই লোকমাটি মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখ থেকে অবোরে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। উপস্থিত নারীরা বিস্মিত হয়ে গেলেন যে, তাঁর (রা.) চোখ দিয়ে কেন অশ্রু ঝরছে? তখন কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? কী চমৎকার ও নরম রুটি, অথচ তা আপনার গলায় আটকে যাচ্ছে! তিনি (রা.) উত্তর দিলেন, আমার গলায় এই রুটি এর শুষ্কতার কারণে আটকে যাচ্ছে না, বরং এর কোমলতার কারণেই আটকে যাচ্ছে। দুঃখের ঘটনাবলি আমাকে দুঃখিত করে নি; বরং আনন্দের মুহূর্তগুলোই আমাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। এটি আনন্দের সময়, কারণ যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সে অনুযায়ী আমরা সম্পদ লাভ করছি, সবকিছুই পাচ্ছি। এমন এক সময় ছিল, যখন আমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা.) বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরই বরকতে আজ আমরা এসব নিয়ামত লাভ করছি। অথচ তাঁর (সা.) অবস্থা এমন ছিল যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঘরে আগুন জ্বলত না। আর যদি কখনো রুটি তৈরি করা হতো, তাহলে এমনভাবে করা হতো যে, আমরা পাটার ওপর শস্য পিষে নিতাম, তারপর ফুঁ দিয়ে তার খোসাগুলো উড়িয়ে দিয়ে রুটি তৈরি করতাম। আমার স্মরণ হলো, য়ার (সা.) উসিলায় আমরা এসব নিয়ামত লাভ করেছি, তিনি তো আজ আমাদের মধ্যে নেই; তিনি থাকলে আমরা তাঁর (সা.) সামনে এসব নিয়ামত পেশ করতে পারতাম এবং আমাদের ধনসম্পদ তাঁর পদতলে নিবেদন করতে পারতাম। অথচ আমরা-যাদের এসব সাফল্যের সঙ্গে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই- তারাই এসব নিয়ামত ভোগ করছি। এই চিন্তাই আমাকে ব্যথিত করে তুলেছে এবং এর কারণেই ময়দার তৈরি এমন নরম নরম লোকমাও আমার গলায় আটকে যাচ্ছে।

আলী বিন আকবর বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু হুযাইফা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না। অর্থাৎ, ঠেস দিয়ে বা পেছনে হেলান দিয়ে খাই না। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার লিখেছেন, এর কারণ কী? তিনি (সা.) হেলান দিয়ে খেতেন না কেন? তিনি লেখেন, এটি ছিল অহংকারী ও নিজেদের বড়ো মনে করা লোকদের রীতি। মূলত রাজা-বাদশাহদের কাছ থেকেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে কোনো ব্যক্তির যদি এমন কোনো ওজর বা যৌক্তিক কারণ থাকে যার কারণে হেলান না দিয়ে খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য এভাবে খাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উবায়দ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে খাবার পেশ করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র নবী (সা.)! আপনি যদি হেলান দিয়ে খেতেন, তাহলে আপনার জন্য আরও সুবিধা হতো। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) নিজের কপাল মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন, এমনকি তা মাটি স্পর্শ করার উপক্রম হলো। এরপর তিনি (সা.) বলেন, বরং আমি সেভাবেই খাব যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ খায়, এবং সেভাবেই বসব যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ বসে। কেননা আমি তো কেবল একজন সাধারণ মানুষ।

এর ব্যাখ্যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও করেছেন। তিনি (রা.) লেখেন, মহানবী (সা.) যখন খাবার খেতে বসতেন তখন খাবারের দিকে মনোযোগ দিয়ে বসতেন এবং বলতেন, কিছু লোকের এই অহংকারপূর্ণ আচরণ আমার পছন্দ নয় যে, তারা হেলান দিয়ে খাবার খায়, যেন তারা খাবারের মুখাপেক্ষীই নয় এবং খাবারের প্রতি তাদের কোনো দ্রুপই নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) সব বিষয়ে পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁর জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো, তিনি নারীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন। আমার মতে, সে কাপুরুষ ও পুরুষত্বহীন যে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ায়। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন করো, তাহলে তোমরা জানতে পারবে— তিনি (সা.) কতটা সদাচারী ছিলেন! যদিও তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তবুও কোনো দুর্বল নারীও যদি তাঁকে (সা.) দাঁড় করিয়ে রাখতেন তাহলে তিনি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না সেই নারী তাঁকে অনুমতি দিতেন। তিনি (সা.) নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই কিনে নিয়ে আসতেন। একবার তাঁর (সা.) কিছু একটা কেনার প্রয়োজন হলো। একজন সাহাবী (রা.) নিবেদন করলেন, হুযূর! জিনিসটি আমাকে দিয়ে দিন। তিনি (সা.) বলেন, যার জিনিস, তা তার নিজেরই বহন করা উচিত। এ থেকে এমন ধারণা করা উচিত নয়, তিনি কাঠের বোঝাও নিজে বহন করে নিয়ে আসতেন। অর্থাৎ, এ কথা বলা যে, তিনি যেহেতু নিজের জিনিস নিজেই বহন করতেন, তাই হয়ত জঙ্গলেও যেতেন, কাঠ সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলোর বোঝা মাথায় করে নিয়ে আসতেন [এমনটি নয়]; বরং তিনি অন্য কাউকে দিয়ে সেগুলো বহন করিয়ে আনতেন। তবে বাজার থেকে কেনা সাধারণ জিনিসপত্র তিনি সাধারণত নিজেই নিয়ে আসতেন।

মোটকথা, এসব ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, তিনি (আ.) বলেন, এর মাধ্যমে তাঁর সরলতা ও অত্যন্ত অনাড়ম্বর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি (সা.) পায়ে হেঁটেও চলাফেরা করতেন। সে সময় এমন কোনো ভেদাভেদ থাকত না যে, কে সামনে থাকবে আর কে পেছনে থাকবে; যেমনটি আজকাল আভিজাত্য প্রদর্শনকারী লোকদের মধ্যে দেখা যায় যে, তাদের চেয়ে যেন কেউ সামনে চলে না যায়। তাঁর (সা.) মধ্যে এতটা সরলতা ছিল যে, অনেক সময় লোকেরা বুঝতেই পারত না— তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্র নবী (সা.) কে? মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-র দাড়ি সাদা ছিল। ফলে লোকেরা মনে করেছিল, তিনিই মহানবী (সা.)। কিন্তু যখন হযরত আবু বকর (রা.) উঠে [মহানবী (সা.)-এর] কোনো সেবামূলক কাজ করেন এবং এভাবে বুঝিয়ে দেন— ইনি আল্লাহ্র নবী (সা.)— তখন লোকেরা বিষয়টি বুঝতে পারে। কোনো কোনো সময় মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-র সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছেন। একবার তিনি (সা.) আগে চলে গিয়েছিলেন, আরেকবার তিনি (সা.) নিজেই ধীর হয়ে গিয়েছিলেন যেন হযরত আয়েশা (রা.) সামনে চলে যেতে পারেন; ফলে তিনি (রা.) সামনে চলে গিয়েছিলেন।

তেমনিভাবে এ-ও জানা যায়, একবার কয়েকজন হাবশি (কৃষ্ণাঙ্গ) এসেছিলেন, যারা শারীরিক কসরত (বা সার্কাস) দেখাত। মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে তাদের সেই শারীরিক কসরত দেখিয়েছিলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) যখন সেখানে আসেন তখন তাঁকে দেখে হাবশিরা পালিয়ে যায়। মোটকথা, মানুষ যখন গভীরভাবে মহানবী (সা.)-এর জীবন অধ্যয়ন করে, তখন তাঁর জীবন থেকে বহু কিছু জানতে পারে। কিন্তু কিছু নির্বোধ ও অন্তর্দৃষ্টিহীন মানুষ এমনও রয়েছে যারা তাঁর জীবন নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গভীরভাবে অধ্যয়ন

করে না, অথচ তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার জন্য মুখিয়ে থাকে। খ্রিষ্টান ও আর্যদের অবস্থাও এমনটিই।

বর্তমান যুগেও ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশালীন কথাবার্তা বলা হচ্ছে। যাহোক, তাঁর (সা.) মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ আর তাঁর (সা.) প্রতিটি কাজের মধ্যেই রয়েছে অনুসরণীয় আদর্শ।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ خَبِيرٌ مَجِيدٌ

(কেন্দ্রীয় বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)